OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 71
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 593 - 606
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 593 - 606
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

বাঙালি ‘ভদ্রমহিলা’-র নারীশিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধচর্চা (১৯০১-১৯৪৭)

রাহুল বর
গবেষক, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: rahulbarasat555@gmail.com
0009-0006-0928-1154

Received Date *28. 09. 2025*
Selection Date *15. 10. 2025*

Keyword
Women’s education, 20th-century Bengali ‘Bhadramahila’, Periodicals, Patriarchal ideology, Acquisition of knowledge, Financial independence, Conservatism, Controversies.

Abstract
In 19th-century Bengal, the seeds of modern women’s education were sown, though the purpose and methods were fraught with controversy. Most people expressed doubts about the necessity of women's education. Some demanded separate curricula for men and women, while others opposed higher education for women. While a few voices rose in protest against this conservative mindset, they were a small minority. This debate intensified in the 20th century, with the number of critics growing, though still unable to silence their opponents. It was at this time that the ‘Bhadramahila’ entered the discourse. Through essays in various periodicals, some, either openly or under pseudonyms, echoed the patriarchal view that education’s sole purpose was to prepare women for a better domestic life. However, not all women’s voices were so constrained. They challenged the notion that education was merely for becoming a good wife or mother, instead advocating for education as a means of acquiring knowledge. Some even argued that it should enable women to become financially independent. They actively sought out and promoted institutions where girls could receive a quality education. This essay, by analyzing the articles written by these ‘Bhadramahila’ in the 20th century, documents their diverse and evolving thoughts on women’s education.

Discussion

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের ফলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে আধুনিক ধ্যান-ধারণার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। পুরানো ভাবনা-চিন্তার ভাঙনের সূত্রপাত এই সময় থেকে। নতুন চেতনা উন্মেষের ফলে কেউ কেউ সমকালীন নারীর অবস্থা নিয়ে ভাবতে শুরু করে, প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তাদের শিক্ষার আলোকে আলোকিত করার। রাজা রামমহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯২)-এর মতো নারীমুক্তিকামী তো ছিলেনই, এছাড়াও ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১) ও তাঁর নব্যবঙ্গ দল, শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯) প্রমুখের অবদানও বিশেষভাবে স্মরণীয়। ১৮৪৯ সালে ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন (১৮০১-১৮৫১)-এর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল (পরবর্তীকালে বেথুন স্কুল) ছিল এই অগ্রযাত্রার এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। সেপ্টেম্বর ১৮৫০-এ আদালত নারীশিক্ষা বিস্তারে সম্মতি দেয়। এরপর ‘উডের নির্দেশনামা’ (১৮৫৪) নারীশিক্ষা প্রসারে গুরুত্ব বাড়ানোর কথা বলে। এইভাবে সমাজসংস্কারক এবং সরকার উভয়ের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 71
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 593 - 606
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

উদ্যোগে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে ওঠে অসংখ্য বালিকা বিদ্যালয়। যদিও শিক্ষার্থীর সংখ্যা আশানুরূপ বৃদ্ধি পায়নি। এর অন্যতম কারণ রক্ষণশীল সমাজ। ব্রাহ্ম পরিবারের মেয়েরা বিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ পেলেও হিন্দুদের ক্ষেত্রে সুযোগ ছিল কম। মুসলমান নারীদের তো সেই অধিকার ছিলই না। তবু মুষ্টিমেয় সংখ্যক যে কয়েকজন শিক্ষার আলো লাভ করেছে তাদের কেউ কেউ অবরোধবাসী বন্দী জীবন সম্পর্কে সচেতন হয়। ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসতে শুরু করে অন্তঃপুর থেকে। সমাজের বৃহত্তর পরিসরে নিজেদের আত্মপ্রকাশের সংকল্প অনুভূত হয় তাদের মনে। এই শতকের ছয়ের দশক থেকে শিক্ষিত মেয়েরা লেখালিখির মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করে। অনুভব করে, নারীশিক্ষার বিস্তারই নারীমুক্তির অন্যতম উপায়। সেই ভাবনাই লিপিবদ্ধ করে তাদের লেখনীতে। বামাসুন্দরী দেবী (?) লেখেন 'কি কি কুসংস্কার তিরোহিত হইলে শীঘ্র এদেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে' (সোমপ্রকাশ, ফাল্গুন ১২৬৭)। এটিই বাঙালি রমনীর লেখা প্রথম প্রকাশিত গদ্য প্রবন্ধ। এই রচনায় প্রাবন্ধিক নারীশিক্ষার পক্ষে অভিমত দেন এইভাবে —

> "স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যাশিক্ষা করাইলে দেশের বিবিধ উপকার হইতে পারে। ...স্ত্রীলোকের বিদ্যা শিক্ষার প্রথা অপ্রচলিত থাকা যে কত অনিষ্টের মূল হইয়াছে, তাহা বর্ণাবলি বর্ণনে অসমর্থা।"[১]

আবার, কৈলাসবাসিনী দেবী (১৮৩৭-?) তাঁর 'হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা' (১৮৬৩)-তে রক্ষণশীলদের নারীশিক্ষা বিরোধী অপপ্রচারকে তীব্র আঘাত হেনে বলেছেন, -

> "বিদ্যার কি পতিঘাতিনি শক্তি আছে যে তদ্দ্বারা নারীগণ পতিরত্নে বঞ্চিতা হইবে? ...বিদ্যা কি নিকৃষ্ট পদার্থ যে তৎ সংস্পর্শে নারীগণ নিকৃষ্টমার্গে পদার্পণ করিবে?"[২]

এইভাবে নারীশিক্ষা ক্রমশ প্রসারিত হলেও সমস্যা তৈরি হয় এর শিক্ষাপদ্ধতি এবং পাঠ্য বিষয় নিয়ে। প্রগতিশীল ব্রাহ্মদের সঙ্গে রক্ষণশীল ব্রাহ্ম ও হিন্দুদের মধ্যে এই বিতর্কের সূত্রপাত। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৪-১৮৯৮) ও শিবনাথ শাস্ত্রীর মতো আধুনিক ধ্যান-ধারণার অধিকারী ব্রাহ্মরা যখন দাবি করছেন নারী ও পুরুষের পাঠক্রমে সমতা বজার রাখার জন্য, তখন এর বিপরীত অভিমত দেন কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪), উমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪০-১৯০৭) প্রমুখ। তাঁরা নারীশিক্ষার পক্ষপাতী হলেও তাদের উচ্চশিক্ষার বিরোধিতা করেন। এই রক্ষণশীলদের ভিড়ে হাতেগোণা কয়েকজন যুক্তিবাদী আধুনিকদের স্বর খুব বেশি মানুষের কাছে পৌঁছায়নি। তাইতো, সমকালীন সময়ে নারী লিখিত অধিকাংশ রচনাতেই সাংসারিক উন্নতিকেই তাদের শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। এই ভাবনা তাদের মধ্যে ঢুকিয়েছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিনিধিরা। উনিশ শতকীয় 'বাঙালি ভদ্রলোক' শ্রেণির অধিকাংশই নারীশিক্ষার প্রসার চেয়েছে দাম্পত্য জীবনকে নিজের মতো করে সাজিয়ে তোলার প্রয়োজনেই। 'স্বামী-স্ত্রীর সদ্ভাব', 'বিদ্যার মহিমা', 'শিল্পকর্ম', 'গৃহধর্ম'—'বামাবোধিনী পত্রিকা' মেয়েদের লেখার জন্য এই বিষয়গুলি নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল। এর থেকে বোঝা যায়, নারীশিক্ষার বিস্তারে পুরুষদের উদ্দেশ্য কী ছিল। এমনই ভাবধারায় গড়ে ওঠা নারীদের কলম তাই সুমাতা, সুপত্নী, সুগৃহিণী হওয়াকেই নারীশিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য বলে প্রচার করতে থাকে। স্বামীসেবা, সন্তানকে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া, পরিবারের সকল সদস্যকে সমানভাবে যত্ন করা, টাকা-পয়সার দৈনন্দিন হিসেব, স্বামী দূরবর্তী স্থানে থাকলে তাকে চিঠি লেখার মধ্যেই তারা শিক্ষার সার্থকতা খুঁজে পায়। তবে, প্রচলিত এই ধারণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদও ধ্বনিত হয়েছে কোনও কোনও নারীকলমে। কৃষ্ণভাবিনী দাস (১৮৬২-১৯১৯) তাঁর 'শিক্ষিতা নারী' (সাহিত্য, আশ্বিন ১২৯৮) প্রবন্ধে প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে গিয়ে যুক্তি সহকারে দেখিয়েছেন যে, মেয়েদের উচ্চশিক্ষা সমাজের জন্য কেবল সম্ভবই নয়, উপকারীও। আরও বলেন, শিক্ষা পেলে নারীদের জ্ঞানশক্তিও বৃদ্ধি পাবে। তিনি আমেরিকা ও ইংল্যান্ডের উদাহরণ দিয়ে দেখান, সেখানকার নারীরা কেরানি, ডাক্তার, অ্যাটর্নি প্রভৃতি বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত হয়ে সফলভাবে কাজ করছে। প্রচুর উপার্জনও করছে তারা। সাহিত্যিক হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিতও হয়েছে কেউ কেউ। স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২)-ও নারীর উচ্চশিক্ষার কথা বলেন। তাঁর লেখালিখি এবং গৃহীত উদ্যোগের মাধ্যমে এটাই প্রমাণ করেছেন যে, বহুযুগব্যাপী অশিক্ষার অন্ধকারে ঢেকে রাখার কারণে মেয়েরা আজ পিছিয়ে। তারা পুরুষের সমান শিক্ষালাভের যোগ্য। মানকুমারী বসু (১৮৬৩-১৯৪৪) তাঁর 'বিগত শতবর্ষে ভারত রমণীদিগের অবস্থা' (অগ্রহায়ণ ১৩০১-ভাদ্র ১৩০২) রচনায় ভারতবর্ষের বিভন্ন অঞ্চলের নারীদের দৃষ্টান্ত

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 71
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 593 - 606
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

উপস্থাপন করে প্রমাণ করেছেন যে, মেয়েরা উচ্চশিক্ষা লাভের যোগ্য। উনিশ শতকে এইভাবে কোনও কোনও নারী পুরুষতান্ত্রিক ভাবাদর্শের বাইরে বেরিয়ে নারীর উচ্চশিক্ষার কথা বললেও তা ছিল মুষ্টিমেয় মাত্র। বিশ শতকে এই সংখ্যা বাড়লেও প্রতিপক্ষের কণ্ঠকে দমন করা যায়নি। তাই, এই বিতর্ক চলতেই থাকে। বর্তমান নিবন্ধে বিংশ শতাব্দীর স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত বাংলার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত 'বাঙালি ভদ্রমহিলা' রচিত নারীশিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধাবলী বিশ্লেষণের মাধ্যমে তৎকালীন সময়ে মেয়েদের শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ছিল, অর্থাৎ সাংসারিক জীবনে উন্নতি না উপার্জনশীল হওয়া নাকি জ্ঞান অর্জন করে মানুষ হওয়া কোনটি মেয়েদের শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, নারী জীবনের সার্থকতা কোথায়, শিক্ষা কীভাবে সেই লক্ষ্যপূরণে এগিয়ে নিয়ে যাবে ইত্যাদি বিষয়গুলি পর্যালোচনা করা হয়েছে। 'বাঙালি ভদ্রমহিলা' একটি ধারণা। উনিশ শতকে মূলত ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা এর সৃষ্টি। যত দিন গেছে ধারণাটি তত বিকশিত ও বিবর্তিত হয়ে অন্যদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে। এই নিবন্ধে 'ভদ্রমহিলা' বলতে বোঝানো হয়েছে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বিশেষ গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বাঙালি নারীদের, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও নারী উন্নয়মূলক কাজকর্মে অংশগ্রহণ যাদের পরিচিতি নির্মাণ করেছে এবং অন্যান্য মহিলারা যাদের অনুসরণ করে থাকে। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়কে বেছে নেওয়ার কারণ, দেশভাগ পরবর্তী সময়ে বাস্তুহারা মেয়েরা শিক্ষাকেই বেঁচে থাকার হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করেছিল। নারীশিক্ষা নিয়ে সমাজে এতদিনকার সংস্কারগুলি হঠাৎ করেই বদলে যেতে থাকে এই সময়ে। নারীশিক্ষার উদ্দেশ্যেরও পরিবর্তন ঘটেছিল বহু পরিবারের কাছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অথবা সংস্থায় চাকরি খুঁজে নেয় তারা। এছাড়া, স্বাধীন ভারতবর্ষের সরকার এই সময়ে নারী বিষয়ক যে প্রস্তাবগুলি পাস করে তার প্রভাবও পড়ে শিক্ষার উপরে। এই কারণেই '৪৭ পরবর্তী নারীশিক্ষা বিষয়ক আলোচনার জন্য আলাদা পরিসরের প্রয়োজন।

(১)

নারীশিক্ষা বিস্তারের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেলেও শিক্ষার্থীর সংখ্যা আশানুরূপ বৃদ্ধি পায়নি। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে শতদলবাসিনী বিশ্বাস (১৮৮৩-১৯১১) দেখেছেন, হিন্দু কন্যাদের বিয়ের বয়স সর্বোচ্চ বারো বছর হওয়ায়, এই অল্প সময়ের মধ্যে ঠিকমতো শিক্ষালাভ সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। এক শ্রেণির অভিভাবক মনে করে, মেয়েরা একটু লিখতে-পড়তে পারলেই তাদের স্কুল থেকে ছাড়িয়ে আনা উচিত। এছাড়াও আরেক শ্রেণির আশঙ্কা, অধিক পড়াশোনা করিয়ে মেয়েকে শিক্ষিত করা হলেও পণের অঙ্ক না মেটাতে পারলে শিক্ষিত সুপাত্র জোগাড় করা যাবে না। ফলে নিজের শিক্ষিত মেয়েকে অশিক্ষিত পাত্রের হাতে সমর্পন করতে হবে। অন্য শ্রেণির অভিভাবক আছে যারা মেয়েদের উপযুক্ত শিক্ষা প্রদানকে কর্তব্য মনে করলেও, তাদের বিশ্বাস— ধর্মের সঙ্গে সমাজের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে এবং কোনও সামাজিক নিয়ম ভঙ্গ করলে 'ধর্ম্মেও পতিত হইতে হয়'। তাই, বারো বছরের মধ্যে মেয়েদের বিয়ে দিয়ে শাস্ত্র ও সমাজের কাছে নির্দোষ থাকতে চায় তারা। প্রাবন্ধিকের প্রশ্ন, কুল রক্ষার জন্য শাস্ত্রের নিয়ম লঙ্ঘন করা যদি দোষের না হয়, তাহলে মেয়েদের শিক্ষার জন্য কেন বিয়ের বয়স বাড়ানো যাবে না।[৩] 'বাল্যবিবাহ ও মেয়েদের শিক্ষা' (ভারতী চৈত্র ১৩৩০) প্রবন্ধেও একই অভিমত পোষণ করা হয়েছে। প্রবন্ধ রচয়িতা নিজের নাম প্রকাশ করতে না চাইলেও তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য আমাদের অভিভূত করে। ১১-১২ বছর বয়সে বিয়ে হলে মেয়েদের হাতেখড়ি দিতে দিতেই শিক্ষা সমাপ্ত হয়ে যায়, কারণ শ্বশুরবাড়ির লোকজন 'নিজেদের মনের মতো' শিক্ষা দিতে পারে না। ধনী পরিবারের মেয়েরাও বাল্যবিবাহের কারণে এবং দরিদ্র পরিবারের মেয়েরা আর্থিক সংকটের জন্য লেখাপড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, দাস যদি শিক্ষা পায় তাহলে সে আর অবরুদ্ধ থাকতে চায় না। ঠিক তেমনই মেয়েদের যদি স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তাহলে তাদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়ে। বাল্যবিবাহকে শিক্ষা ও স্বাধীনতার পথে প্রধান কাঁটা বলে উল্লেখ করা হয়েছে এই রচনায়। 'প্রবাসী' সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (১৮৬৫-১৯৪৩)-এর সমর্থন পাই এই বক্তব্যের। তিনি বলেন, ছোটোবেলায় মেয়েরা যা কিছু শেখে বিবাহের পরে চর্চার অভাবে তা ভুলে যায়। আরও বলেন, -

> "ভারতের ভদ্রঘরের মেয়েরা অজ্ঞতায় বিধ্বস্ত এবং নিম্নশ্রেণীর মেয়েরা অজ্ঞতার উপরন্তু পরিশ্রমে বিধ্বস্ত।"[৪]

তাই ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে হরবিলাস সারদা (১৮৬৭–১৯৫৫)-র উদ্যোগে 'বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন' পাশ হওয়ায় তাঁর প্রত্যাশা,

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 71
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 593 - 606
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "এখন বালিকাদিগকে অন্যূন চৌদ্দ বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্য্যন্ত অবিবাহিত রাখিতে হইবে।...ছয় বৎসরে হাতে-খড়ি দিয়া চৌদ্দ বৎসর পর্য্যন্ত লেখাপড়া শিখাইলে আট বৎসরে মোটামুটি অনেক বিষয় শিখান যাইতে পারে।"[৫]

আধুনিক শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্ত মেয়েরা নিজেদের সার্বিক পরাধীনতা মোচনে সামাজিক কুপ্রথা দূর করে স্বাধীন হওয়ার জন্য যে লড়াই করেছিল, সেখানে পাশে পেয়েছিল রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মতো ব্যক্তিত্বকে, যিনি তৎকালীন সমাজে দাঁড়িয়ে বহুলাংশেই মুক্ত মনের পরিচয় দিয়েছেন।

(২)

নারীশিক্ষা প্রচলিত হওয়ার পর তা মেয়েদের এবং সমাজের জন্য হিতকর নাকি ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়িয়েছে, সমকালে এই বিতর্ক অন্যতম স্থান দখল করে রেখেছিল। 'জনৈক আসামী' ছদ্মনামে ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী (১৮৭৩-১৯৬০) তাঁর 'বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষাবিচার' (ভারতী, শ্রাবণ ১৩১৯) প্রবন্ধে এই বিষয়টির একটি তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের প্রতি তৎকালীন সমাজ যেভাবে বিরূপতা পোষণ করে একপ্রকার কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিল তার জবাব দেওয়ার জন্য প্রাবন্ধিকের এমন ছদ্মনাম গ্রহণ। কারণ, তিনি নিজেও নব্য শিক্ষায় শিক্ষিত। তাই তিনি 'আসামী'। সামাজিক সকল অনুষ্ঠানের মতো নারীশিক্ষার ফল সম্পূর্ণ ভালোও হয়নি, আবার পুরোপুরি মন্দও হয়নি। তাই এটি এককথায় বা সামগ্রিকভাবে বিচার করা অসম্ভব বলে তাঁর অভিমত। বোঝাই যায় যে, নারীশিক্ষার ফলাফল সম্বন্ধে প্রাবন্ধিকের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ইতিবাচক নয়। নারীশিক্ষার বিরুদ্ধে সমকালে ধর্মভাবের হ্রাস, নম্রতা ও বাধ্যতার অভাব, গৃহকর্মে অক্ষমতা বা তাচ্ছিল্য, স্বাস্থ্যহানি, বিলাসিতা, আমোদপ্রিয়তা, স্বার্থপরতা, বিদেশি আদব-কায়দার প্রতি আকর্ষণ প্রভৃতি একের পর এক যে অভিযোগগুলি হানা হয়েছিল, সেগুলির উল্লেখ করে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা ও বিশ্লেষণ করেছেন প্রাবন্ধিক। এগুলির মধ্যে নারীর স্বাস্থ্যহানি এবং বিদেশিয়ানার প্রতি আকর্ষণের অভিযোগকে কেবল যুক্তিযুক্ত বলেছেন এবং বাকিগুলির অসারতা প্রতিপন্ন করেছেন তিনি। বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার কঠিন সংগ্রামের ফলে নারীদের শারীরিক ও মানসিক শক্তি ক্ষয় হয়। তাই নারী ও পুরুষের ভিন্ন ভবিষ্যৎ জীবনের কথা মাথায় রেখে তাদের একইরকম শিক্ষা দেওয়া সমীচীন নয়। শিক্ষিত মেয়েরা বিদেশিদের অন্ধ অনুকরণ করতে গিয়ে বিবিয়ানার অপসংস্কৃতি লাভ করছে, তারা নারীশিক্ষার মর্যাদা রক্ষণে অক্ষম হয়ে পড়ছে বলেও প্রাবন্ধিকের অভিমত। কিন্তু উল্লিখিত অভিযোগ দুটি পুরুষদের ক্ষেত্রেও সমান সত্য। এমনকি উনিশ শতক থেকে যে 'বাবু কালচার' কলকাতার বুকে দেখা গিয়েছিল তা তো সাহেবদেরই অনুকরণ। এই অভিযোগ অনুযায়ী ছেলেদেরও শিক্ষা দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া উচিত। কিন্তু এই বিষয়ে আলোচনা আমরা এই প্রবন্ধে পাই না। তিনি তাঁর অপর এক রচনা 'আদর্শ' (সবুজপত্র, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩২২)-তে 'গার্হস্থ্যধর্ম'-কেই 'মেয়েদের প্রধান কর্ম্ম' হিসেবে দেখেছেন। তবু আধুনিক বঙ্গনারী কী করলে, কী বেশ ধারন করলে, গৃহস্থালী ও সামাজিক আচার-আচরণ কীভাবে পালন করলে 'সুশোভন', 'সুসঙ্গত', 'সুশৃঙ্খল নব্য বঙ্গসমাজ' গড়ে উঠতে পারে এই প্রশ্নের উত্তরে কন্যাসন্তানকে 'বিবাহের পাত্রী' হিসেবে না দেখে 'জীবনের যাত্রী' রূপে গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন। শান্তা দেবী তাঁর 'স্ত্রীলোকের অধিকার' (প্রবাসী, পৌষ ১৩২৪) রচনায় নারীশিক্ষার বিস্তারে সমাজের বিভিন্ন প্রথা এবং আদর্শ কীভাবে বাধা সৃষ্টি করে সে সম্পর্কে বলেছেন, সমাজে মেয়েদের শিক্ষা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা সীমিত করে রাখা হয়েছে। কোনও মেয়ে সামান্য কোনও কাজে সাফল্যলাভ করলে তাকে অত্যধিক প্রশংসা করা হয়। ফলে সে মনে করে, তার উচ্চ-শিক্ষায় যাওয়ার প্রয়োজন নেই, যা উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করে। আরও বলেন, নারীশিক্ষার লক্ষ্য কেবল গৃহিণী হওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে উচ্চতর আদর্শের দিকে ধাবিত হওয়া উচিত। মনে করেন, পুরুষের মতোই নারীদেরও গভীর বিষয় নিয়ে চিন্তা করার এবং সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সমস্যা সমাধানে অবদান রাখার ক্ষমতা রয়েছে। মানব সমাজের পূর্ণ বিকাশের জন্য নারী ও পুরুষের চিন্তাধারার পারস্পরিক আদান-প্রদান অপরিহার্য। উনিশ শতকে কৃষ্ণভাবিনী দেবী উপার্জনের বার্তা দিয়েছিলেন সেই সব শিক্ষিত সহায়-সম্বলহীন মেয়েদের, যাদের তা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু, সময়ের থেকে এগিয়ে থাকা বেগম রোকেয়া (১৮৮০-১৯৩২) সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে বিষয়টি দেখেছেন—

> "উপার্জ্জন করিব না কেন? আমাদের কি হাত নাই, না পা নাই, না বুদ্ধি নাই? কি নাই?"[৬]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 71
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 593 - 606
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আরও বলেছেন, -

> "আবশ্যক হইলে আমরা লেডীকেরানি হইতে আরম্ভ করিয়া লেডীমাজিষ্ট্রেট, লেডীব্যারিষ্টার, লেডীজজ — সবই হইব! পঞ্চাশ বৎসর পরে লেডী viceroy হইয়া এদেশের সমস্ত নারীকে "রাণী" করিয়া ফেলিব!"[৭]

তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুল' (১৯১১)-এর শিক্ষার্থীরা সাফল্য অর্জন করলে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন এই বলে যে, -

> "আমার সেই বত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের মতিচূরে কল্পিত লেডী ম্যাজিস্ট্রেট, লেডী ব্যারিস্টারের স্বপ্ন আজ বাস্তবে পরিণত হইতে চলিয়াছে— আমার এ আনন্দ রাখিবার স্থান কোথায়? ...আমার মিনারের সাফল্য আজ আমি স্বচক্ষে দেখিতে পাইলাম।"[৮]

(৩)

এইভাবে একদিকে যেমন নারীর উচ্চশিক্ষার দাবি তোলা হয়, তেমনই এর বিপরীত অভিমতেরও অভাব হয় না। অনুরূপা দেবী (১৮৮২-১৯৫৮) তাঁর 'স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে দু-একটী কথা' (ভারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ ১৩২৭) প্রবন্ধে সমকালীন নারীশিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে নিজস্ব অভিমত দিয়েছেন। তাঁর মতে, নারীর শিক্ষা এমন হওয়া উচিত যা তাদের দুটি প্রধান ভূমিকা— 'গৃহিণী' ও 'জননী' পালনের জন্য সম্পূর্ণ উপযোগী হয়। আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থার সমালোচনা করে বলেছেন যে, পরীক্ষার চাপে এবং অপ্রয়োজনীয় বই পড়ার কারণে মেয়েদের স্বাস্থ্য ভেঙে যাচ্ছে। এর ফলে তাদের শরীর দুর্বল হয়ে পড়ছে; লাবণ্য, স্ফূর্তি ও সজীবতা নষ্ট হচ্ছে, যা বাল্যবিবাহ বা অকাল মাতৃত্বের চেয়েও খারাপ। কেবল ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী বা অনুরূপা দেবী নন, এর আগে দীনেশচন্দ্র সেন (১৮৬৬-১৯৩৯)-ও একই ধরনের বক্তব্য রেখেছেন।

> "অনেক সময় স্কুলে ৫ ঘন্টা আবদ্ধ থাকার ফলে মেয়েদের স্ফূর্ত্তি কমিয়া যায়, তাহারা রোগা হইয়া যায়। রূপলাবণ্য যখন মেয়েদের একটা প্রধান মূলধন, তখন তাহা খোয়ান উচিত নহে।"[৯]

বোঝা যায়, অনুরূপা দেবীর এই ভাবনায় বহুদিন আগে থেকে রসদ জুগিয়ে এসেছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ। এর বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলেন জ্যোতির্ময়ী দেবী (১৮৯৪-১৯৮৮)। তাঁর অভিমত, -

> "মহিলা-শিক্ষার কথা উঠলেই পুরুষেরা ভয় পেয়ে যান, -পাছে ওই উৎপীড়িতারা উৎপীড়ন বুঝতে পারেন, পেরে বিদ্রোহী হয়ে উঠেন; যথেচ্ছাচার সহ্য না করেন! তাই কত রকম করে বলা হয়, ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে আমরা পবিত্র ভারতবর্ষের পুণ্য আদর্শ থেকে বিচ্যুত হচ্ছি।"[১০]

অপর এক রচনায় বলেন,

> "আমরা শিক্ষা দেব এমন করে, যাতে সত্য বা ধর্ম্ম অভ্যাসগত না হয়—বন্ধনমাত্র না হয়— মানুষ মুক্ত থাকে।"[১১]

যদিও উপেন্দ্রনাথ জ্যোতিরত্ন (?)-এর মতো পুরুষতন্ত্রের প্রতিনিধি জ্যোতির্ময়ী দেবীর বিরোধিতা করে বলেন, পাশ্চাত্য প্রথায় নারীকে শিক্ষা দিলে তার কুফল অবশ্যম্ভাবী। 'বিলাতে সফরিগেট', 'আমেরিকায় বিবাহ ব্যবস্থা' যেমন একটা চুক্তি মাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে, ভারতবর্ষেও তেমনই ঘটবে। এদেশীয় মেয়েরা ক্রমশ আরও উৎশৃঙ্খল হয়ে উঠবে, তাদের পতিব্রতা, সতীত্ব প্রভৃতি সদ্গুণ অপসৃত হবে।[১২] একা উপেন্দ্রনাথ নন, রক্ষণশীল পিতৃতন্ত্রের প্রতিনিধি মাত্রেই এইধরনের বক্তব্য রাখেন। একইভাবে অনুরূপা দেবী বলেন, নারীশিক্ষার প্রধান বিষয় হওয়া উচিত উচ্চাঙ্গের সাহিত্য, শিল্পকলা, ইতিহাস, ভূগোল, উত্তমরূপে স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও গৃহকর্ম। অন্যদিকে গণিত ও রসায়ণ শিক্ষা সাধারণভাবে হলেই চলবে। কারণ, এই ধরনের শিক্ষা গৃহস্থ কন্যার উপযোগী কার্যকর শিক্ষাকে অসম্পূর্ণ রাখছে এবং মেয়েদেরকে কেবল পুঁথিগত বিদ্যার অধিকারী করে তুলছে। তাই, মেয়েদের কার্যকরী বিদ্যা—রান্না, পান সাজা, ছোটো ভাই-বোনের যত্ন, গৃহকর্ম প্রভৃতি বিষয়গুলি শেখানো উচিত। মেয়েদের স্বধর্মভক্ত, পরধর্মসহিষ্ণু, স্বজনপ্রেমিক, স্বদেশানুরক্ত, দরিদ্রসেবক এবং পবিত্র চরিত্রের অধিকারী হতে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 71
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 593 - 606
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

শেখানো প্রয়োজন। আমাদের মনে পড়ে, 'বামাবোধিনী পত্রিকা' মেয়েদের পুঁথিগত শিক্ষার উপর তেমন জোর দেয়নি। তাদের নারীশিক্ষার ভাবনা মেয়েদের সাংসারিক জীবনে উন্নতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাই, যখন নারীর উচ্চশিক্ষার প্রসঙ্গ আসে তখনও তারা সুমাতা হিসেবে গড়ে তোলার কথাই বলে।

> "রমণীগণ উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিতা না হইলে সন্তানদিগের সঙ্গে কখন কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, সন্তানদিগের সাক্ষাতে কিরূপ কথাবার্তা বলিতে হইবে, তাহাদিগের সম্মুখে কখন কিরূপ আদর্শ ধরিতে হইবে, তাহাদের শিক্ষার জন্য, সুখের জন্য, আমোদের জন্য, আদর ও শাসনের জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে এই সকল গুরুতর বিষয়ে কি রূপে জ্ঞানলাভ করিবেন?"[১৩]

অনুরূপা দেবীর রচনায় এই বক্তব্যেরই প্রতিফলন দেখতে পাই। তবে, বিশ শতকের আধুনিক ভাবনায় উদ্বুদ্ধ নারী-সমাজ এমন রক্ষণশীলতার বিরোধিতা করতে পিছুপা হয়নি। নব্য-শিক্ষানুরাগী ছদ্মনামে 'ভারতী' পত্রিকায় অনুরূপা দেবীর এই বক্তব্যের বিরুদ্ধাচরণ করে লেখা হয় 'স্ত্রীশিক্ষার কথা' (অগ্রহায়ণ ১৩২৮)। অনুরূপা দেবী প্রাচীনকালের ক্ষুদ্র অন্তঃপুরের আদর্শ তুলে ধরলেও, বর্তমান প্রবন্ধের রচয়িতা সেটির বিরোধিতা করে বলেছেন যে, প্রাচীনকালে কোনও দেশেই নারীরা অন্তঃপুরের ক্ষুদ্র সীমায় আবদ্ধ ছিল না। বর্তমানে একমাত্র বঙ্গদেশ ভিন্ন ভারতের অন্য কোনও স্থানেই নারীরা আবদ্ধ নয়। অনুরূপা দেবী মেয়েদের স্বাস্থ্য ও আয়ু হ্রাস সম্বন্ধে যে বক্তব্য রেখেছেন তার উত্তরে নব্য-শিক্ষানুরাগী বলেছেন যে, অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস, উপযুক্ত খাদ্যের অভাব, শারীরিক পরিশ্রম না করা এবং মুক্ত বায়ু সেবন না করাই এসব ক্ষতির মূল কারণ। তাই তার প্রতিকার করা উচিত, স্কুল-কলেজ বন্ধ করার চেষ্টা করা উচিত নয়। তবে এর পরেও শিক্ষার প্রয়জনে মেয়েদের স্বাস্থ্যহানি বিষয়টি মেনে নিতে পারেনি পুরুষতান্ত্রিক সমাজ। চারুচন্দ্র মিত্র (?)-এর 'নারী: পাশ্চাত্য সমাজে ও হিন্দু সমাজে' (১৩৪৪) গ্রন্থে এ ধরনের বক্তব্য পাই। মেয়েরা লেখাপড়া শিখে চাকরি করুক—এমনটাও তিনি চাননি। নব্যশিক্ষায় শিক্ষিত মেয়েরা 'অসরলা' ও 'অহঙ্কৃতা'—অনুরূপা দেবীর এই অভিযোগের বিরুদ্ধে 'স্ত্রীশিক্ষার কথা'-র রচয়িতা বলেন যে, নব্য-শিক্ষিতরা লোকসেবা, শিক্ষাদান, চিকিৎসা, ধাত্রীর কাজ, চিত্রাঙ্কন, বস্ত্র বয়ন, ক্ষুধার্তকে অন্নদান এবং রোগীর শুশ্রূষার মতো বিভিন্ন শুভ কাজে মন-প্রাণ ঢেলে দিচ্ছে। তাই এমন অভিযোগ অযৌক্তিক। সবশেষে বলেছেন যে, নব্যশিক্ষা অতি অল্পদিন শুরু হয়েছে এবং এর বিচারের সময় এখনও আসেনি। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেছেন যে, ভবিষ্যতে নারীরা কেবল স্বামী-পুত্রের যত্ন নয়, সাহিত্য, শিল্প-চর্চা, রাজনীতি, সমাজসেবা ও দরিদ্র-নারায়ণের সেবার মতো মহাব্রতে নিজেদের উৎসর্গ করবে। বাঙালি নারীকে 'ভদ্রমহিলা'-য় রূপান্তরের প্রক্রিয়াটি এই ভাবনার মাধ্যমে পরিস্ফুট হয়।

যারা সাংসারিক জীবনে উন্নতিকেই নারীশিক্ষার মূল বলে মনে করে তাদের কাছে আদর্শ হল অ্যানি বেসান্ত (১৮৪৭-১৯৩৩)-এর বহুচর্চিত একটি উক্তি যেখানে বলা হয়েছে, মেয়েদের জন্য যে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন, তা দেশের চাহিদা মেটানোর জন্য হওয়া উচিত। ভারতের এমন নারী প্রয়োজন যারা হবে মহৎ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্ত্রী ও জননী, গৃহের জ্ঞানী ও স্নেহময়ী কর্ত্রী, সন্তানের শিক্ষক, স্বামীর সহায়ক ও পরামর্শদাতা এবং অসুস্থদের দক্ষ সেবক।[১৪] এই বক্তব্যের পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন প্রাবন্ধিক সত্যবালা দেবী (?) 'স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ' (ভারতবর্ষ, শ্রাবণ ১৩২৮) প্রবন্ধে। এই আদর্শকে হিন্দু, ব্রাহ্ম এবং এমনকি নাস্তিক—সকল সম্প্রদায়েরই মেনে নেওয়া উচিত বলে মনে করেন। যুক্তি দেন, এই কাজগুলি সম্পাদনের জন্য নারীদের উপযুক্ত করে তোলাই হল নারীশিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। মেয়েদের 'graduates' হয়ে 'learned profession'-এ না গিয়ে আদর্শ মা ও স্ত্রী হওয়ার শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। প্রাবন্ধিক সত্যবালা দেবী এই অভিমতকেই ভারতীয় নারীর আদর্শ হিসেবে দেখেছেন। 'পরিচারিকা' পত্রিকা নারীশিক্ষার বিরোধিতা না করলেও এর আসল উদ্দেশ্য যে গৃহধর্মপালনে উপযুক্ত করে তোলা, তা উল্লেখ করতে ভুলে যায়নি। রানি নিরুপমা দেবী (১৮৯৫-১৯৮৪)-র সম্পাদনায় বিশ শতকে যখন পত্রিকাটি নবপর্যায়ে প্রকাশিত হওয়া শুরু করল (১৯২৩-১৯৩১) তখনও সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সরে আসেনি। সেখানেও অ্যানি বেসান্তের মন্তব্যটির সমর্থন করে বলা হয়েছে, -

> "নারীকে স্বচেষ্টায় যদি জীবিকা অর্জ্জন না কর্ত্তে হয়, তা হলে স্ত্রীশিক্ষাকে কেবলমাত্র ধর্ম্ম শিক্ষায় পরিণত করা যেতে পারে। জননী, জায়া, গৃহকর্ত্রী, শিক্ষাদাত্রী, সেবাকুশলা, এই সকল হওয়াই মেয়েদের কর্ত্তব্য।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 71
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 593 - 606
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> যদি তাহারা স্বভাবতঃ ওতে নিপুণা না হয়ে উঠতে পারে, সকলে মিলে তাহাদের সাহায্য কর্ত্তে হবে, যাহাতে তাহারা তদ্রূপ হয়ে ওঠে, —এই সাহায্য করাটাই শিক্ষা।"[১৫]

এই ধরনের বক্তব্যের সমালোচনা পাই 'ভারতী' পত্রিকায় বঙ্গনারী ছদ্মনামে লিখিত 'শিক্ষা এবং মাতা ও পত্নীর আদর্শ' (শ্রাবণ ১৩২৯) রচনাটিতে। তাঁর দৃঢ় যুক্তি, পুরুষরা 'graduate' হয়ে 'learned profession'-এ গেলে যদি তাদের পতি হওয়ার পথে বাধা না হয়, তবে মেয়েদের ক্ষেত্রে কেন তা হবে? আরও বলেছেন যে, একজন নারীর ভালো মা ও স্ত্রী হওয়া উচিত, সে বিষয়ে কারও সন্দেহ থাকার কথা নয়, কিন্তু উচ্চশিক্ষিত হয়ে উপার্জনশীল হলেই মেয়েরা সুগৃহিনী হওয়ার যোগ্যতা হারায়—এমন ধারণা ভ্রান্ত। অ্যানি বেসান্তের মতো প্রতিভাবান নারীকে যদি কেবল ঘর-সংসার নিয়ে থাকতে হতো, তাহলে তাঁর প্রতিভা নষ্ট হয়ে যেত। মেয়েদের উচ্চশিক্ষা এবং পেশাগত জীবনে প্রবেশ করার অনেক কারণ রয়েছে। যেমন, নারীশিক্ষার জন্য উচ্চশিক্ষিত শিক্ষয়িত্রী, চিকিৎসার জন্য দক্ষ ডাক্তার ও ধাত্রী, আইনি পরামর্শের জন্য আইনজীবী প্রভৃতি। দিনকাল এমন হয়েছে যে মেয়েদের প্রকৃত উন্নতির জন্য তাদের উপার্জন করাও আবশ্যক হয়ে উঠেছে। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় নিজেদের স্বার্থ রক্ষা এবং সুবিচারের জন্য রাজনীতিতে দক্ষ নারীর প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করেছে তিনি। তাই প্রশ্ন করেন, যদি মেয়েরা স্কুল-কলেজে না গিয়ে বা বই না পড়েই 'আদর্শ শিক্ষিতা' হতে পারে, তাহলে সেই কৌশল কেন ছেলেদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হচ্ছে না? কারণ ছেলেরা এত পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করেও সকলে 'আদর্শ শিক্ষিত' হতে পারছে না। এভাবেই প্রচলিত ধ্যান-ধারণাকে প্রশ্ন করেন তিনি। সমকালীন সময়ে পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে মুষ্টিমেয় যে কয়টি বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে, এটি তার মধ্যে অন্যতম। এমনই আরও একটি রচনা, সোনামাখা দেবী (?)-র **'নারীর কথা'** (ভারতী, আষাঢ় ১৩২৯)। শিক্ষিত সমাজের বিপক্ষে তাঁর অভিযোগ, মুখে নারীশিক্ষার কথা বললেও, বাস্তবে অধিকাংশই মেয়েদের স্বাধীন শিক্ষার বিরোধী। শুধুমাত্র ঘরের হিসেব এবং চিঠি-পত্র লিখতে শেখানোতেই তাদের শিক্ষাকে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। তাই তাঁর ব্যাঙ্গাত্মক অভিমত, অল্পবিদ্যা বাইরের লোকের জন্য ভয়ঙ্কর হলেও অবরোধবাসিনীদের জন্য শুভঙ্করী। আরেক দল আছে যারা নিজেদের শৌখিনতার কারণে স্ত্রীকে শিক্ষিত দেখতে চায়, কিন্তু নারীর সামাজিক বা রাজনৈতিক অধিকারের কথা উঠলেই তারা কান ঢেকে বসে থাকে। এই উভয় দলই নারীকে শুধুমাত্র গৃহিণী রূপেই দেখতে চায়, জীবনের পথে সঙ্গী হিসেবে নয়। ফলে তথাকথিত নারীশিক্ষা এখনও সমাজে একটি বিলাস সামগ্রীর মতোই রয়ে গেছে, যা মেয়েদের নিজেদের জীবনকে পূর্ণতা দিতে বা স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করতে সাহায্য করে না। এই আধুনিক যুক্তিবাণের আঘাতেও রক্ষণশীলদের দুর্মর সংস্কারে ভাঙন ধরানো সম্ভব হয় না। বরং তারা নিজেদের ঢালকে আরও মজবুত করতে চায় এই বলে যে, নারী-পুরুষের সমানাধিকার সম্ভব নয়। কারণ, প্রকৃতিগতভাবে নারীরা পুরুষের তুলনায় পিছিয়ে। এই কারণেই রাজনীতি, বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প এবং বিজ্ঞান—সব ক্ষেত্রেই পুরুষ নারীদের থেকে অনেক এগিয়ে আছে। অপরদিকে, মেয়েদের শিক্ষিত করেও তাদের কাছ থেকে প্রেমের গল্প, কবিতা বা দেশাত্মবোধক গান ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না। অনুরূপা দেবী 'স্ত্রী শিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতা সম্বন্ধে কয়েকটী কথা' (ভারতবর্ষ, শ্রাবণ ১৩৩০) রচনায় এমনই অভিমত রাখেন। যদিও, এমন ধরনের বক্তব্য নতুন নয়। এই প্রবন্ধ রচনার প্রায় চোদ্দো বছর আগে নলিনীকান্ত ভট্টশালী (?) 'ভারত-মহিলা', পত্রিকার মাঘ ১৩১৬ সংখ্যায় লিখেছেন, -

> "স্ত্রী প্রকৃতি ও পুরুষ প্রকৃতিতে একটা বিশেষ বিভিন্নতা আছে; সেই বিভিন্ন অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা করিতে না পারিলে পদে পদে ঠকিতে হইবে। ...জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, বীজগণিত, ডিফারেনশ্যাল কেলকেলাস্ ইত্যাদি প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্ত্রীগণের অবস্থা যে কোথায় হইবে, তাহা আমার বুদ্ধির অগোচর।" (পৃষ্ঠা ৩০৯)

উনিশ শতকে কেশবচন্দ্র সেন সহ অন্যান্যরা যাঁরা মেয়েদের জন্য পৃথক পাঠ্য নির্ধারণের পক্ষপাতী ছিলেন তাঁদের বক্তব্যের সঙ্গে হুবহু মিলে যায় এই ধরনের অভিমতগুলি। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে মেয়েরাই। গৌহাটির 'বালিকা বিদ্যালয়' থেকে সুনীতিবালা গুপ্ত লেখেন, এই একই যুক্তিতে ছেলেদের পাঠক্রম থেকেও জ্যামিতি, পরিমিতি তুলে দেওয়া উচিত। কারণ, অধিকাংশ ছেলেই তো শেষ পর্যন্ত কেরানি, উকিল, মুন্সেফ হবে। সেখানে এইসব বিদ্যা কোনও কাজেই লাগবে না।[১৬] তাই তাঁর প্রশ্ন, 'জ্ঞানোপার্জন করাই কি বিদ্যাশিক্ষার শ্রেষ্ঠতম উদ্দেশ্য নয়?' শ্রীযুক্ত ভট্টশালীর উপরিউক্ত অভিমত যে অযৌক্তিক

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 71
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 593 - 606
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

তা বহু নারীই নিজেদের শিক্ষাগত যোগ্যতা দিয়ে প্রমাণ করেছেন। কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৬১-১৯২৩) ১৮৮৬ সালে মেডিকেল ডিগ্রি লাভ করেন, যা তাঁকে দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম মহিলা ডাক্তার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। চন্দ্রমুখী বসু (১৮৬০-১৯৪৪) ছিলেন কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের সমসাময়িক। ১৮৮৪ সালে তিনি স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন এবং পরবর্তীতে বেথুন কলেজে অধ্যাপনা করেন। স্বর্ণকুমারী দেবী, সরলা দেবী চৌধুরানী (১৮৭২-১৯৪৫) প্রভৃতি নামও স্মরণীয়। শান্তিসুধা ঘোষ (১৯০৭-১৯৯২) ১৯৩০ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে মিশ্র-গণিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেছেন। অত্যন্ত মেধাবী এই ছাত্রী সমকালীন সময়ে আই.এ. পরীক্ষায় তিনি তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন। নারীশিক্ষার উন্নতি দেখে অভিভূত শিবনাথ শাস্ত্রী তাদের উপর ভরসা রেখে বলেছেন, -

> "নারীগণকে উন্নত করিলেই তাঁহারা সমাজকে উন্নত করিয়া তুলিবেন; ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্যরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। ...আমি ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারি বঙ্গদেশের সমাজিক উন্নতি ইহার নারীগণের সাহায্যে ইহইবে।"[১৭]

মনে রাখতে হবে, উক্তিটি করা হয়েছে ১৯০৪ সালে, তখনও মেয়েদের শিক্ষাদানের প্রতি বাংলার অধিকাংশ জনগণই বিরূপ। বরং তারা এর কুফল খুঁজতেই ব্যস্ত ছিল। এমন সময়ে দাঁড়িয়ে শিবনাথ শাস্ত্রীর এই আশ্বাসবাণী তাঁর দূরদৃষ্টির পরিচয় দেয়। একইসঙ্গে যারা নারীশিক্ষার প্রগতিতে আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছে, তারাও নতুন উদ্যমে কাজ করার প্রেরণা পায়। মেয়েদের শিক্ষাক্ষেত্রে যে অপারকতার অভিযোগ নিরুপমা দেবী তুলেছেন তার উত্তরও বহু আগেই কৃষ্ণভাবিনী দাস দিয়ে গেছেন। বলা হতো যে, পুরুষের তুলনায় নারীর মস্তিষ্ক পাঁচ আউন্স কম হওয়ায় তারা বিদ্যায় ও জ্ঞানে পুরুষের সমান হতে পারবে না। কৃষ্ণভাবিনী দেবী এই ধারণার বিরোধিতা করে বলেন যে, জন্মগতভাবে নয়, বরং যুগ যুগ ধরে উপযুক্ত শিক্ষার অভাবের কারণে এমনটা হয়েছে (দ্র. 'শিক্ষিতা নারী')। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এতকিছুর পরেও নিরুপমা দেবী বলেছেন, নারীদের শিক্ষা পুরুষদের মতো না হয়ে নারীদের জীবনের জন্য উপযোগী হওয়া উচিত। নারীর প্রকৃত অবস্থান তার গৃহে। কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকারের বিরুদ্ধেও যুক্তি দিয়েছেন তিনি। আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, নারী-পুরুষ উভয়েই কর্মক্ষেত্রে গেলে সন্তানদের যত্নের অভাব, ঘরের কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন না হওয়া—প্রভৃতি বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে। তাই নারীর পুরুষ হওয়ার বাসনা ত্যাগ করে একজন ভালো স্ত্রী ও মা হওয়া উচিত। আরও বলেন যে, নারীদের উপার্জনের প্রয়োজন আছে, তবে তা পুরুষদের সঙ্গে চাকরির প্রতিযোগিতায় না হয়ে কুটির শিল্প, যেমন সূতা কাটা, বোতাম তৈরি, সেলাইয়ের কাজ বা ধাত্রীবিদ্যার মতো পেশার মাধ্যমে হওয়া উচিত। বিশ শতকে যখন নারীরা শিক্ষা ও পেশাগত ক্ষেত্রে একের পর এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছে, সেই সময় এমন ধরনের বক্তব্য নিয়ে যথেষ্ট সমালোচনা হওয়াই স্বাভাবিক। হয়েছিলও। বঙ্গনারী ছদ্মনামে 'ভারতী'-তে লেখা হয় 'স্ত্রী শিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতা সম্বন্ধে কয়েকটী কথা' (অগ্রহায়ণ ১৩৩০)। সেখানে উপরিউক্ত বক্তব্যের প্রতিবাদে লেখা হয়েছে, লেখিকা যাকে 'উদ্দাম স্ত্রী-স্বাধীনতা' বলেছেন, তার অর্থ স্পষ্ট নয়। যারা নারীশিক্ষা ও স্বাধীনতার পক্ষে কাজ করছে, তারা আসলে উৎশৃঙ্খলতা বা লাগামহীনতা চায় না। বরং তাদের মূল লক্ষ্য হল, নারী ও পুরুষের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা এবং পুরুষদের মধ্যে যেমন স্বাধীনতার অপব্যবহার হয়, তা থেকে নারীকে মুক্ত রাখা। নারীদের উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে যে অভিযোগ করা হয়েছে, সমালোচক তার তীব্র বিরোধিতা করেছেন। যুক্তি দিয়েছেন যে, মানব সমাজের উন্নতি হলে পারিবারিক ব্যবস্থাকেও সেই অনুযায়ী পরিবর্তন করতে হয়। যদিও সব মানুষ সব বিষয়ে সমান নয়, কিছু মৌলিক অধিকার মানুষ হিসেবে সবারই প্রাপ্য। নারী যে পুরুষের মতোই একজন মানুষ, এই জ্ঞান থেকে তারও সব অধিকার প্রাপ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। পারিবারিক দায়িত্ব সম্পর্কে বলেন, স্বামী-স্ত্রী উভয়েই শিক্ষিত হয়ে চাকরি করলে তাদের সন্তানদের অযত্ন হবে, এমন সম্ভাবনা নেই। পিতা-মাতার কর্তব্য কী হবে, তা তাদের নিজেদেরই ঠিক করে নেওয়া উচিত। পুরুষের অর্থ উপার্জন করা উচিত, তবে নারীদেরও বাধা থাকা উচিত নয়। প্রশ্ন করেন, নারীকে অধীন করে না রাখলে কি তারা তাদের কর্তব্য পালন করবে না? পুরুষরা তাদের স্বাধীনতা ও অধিকার থাকা সত্ত্বেও যদি তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারে, তাহলে নারীরা স্বাধীনতা পেলেই 'উন্মাদ' হয়ে উঠবে, এমন ধারণা যৌক্তিকতাহীন। গুরুত্বারোপ করেছেন ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর। তিনি মনে করেন, স্বাধীনতার অভাবই মানুষের সবচেয়ে বড়ো অভাব। তাই দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে, নারীদের অধীনতা থেকে মুক্ত হওয়া উচিত। এই ভাবনাটি

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 71
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 593 - 606
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আধুনিক সমাজে ব্যক্তিগত স্বায়ত্তশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণের ধারণাকে প্রতিফলিত করে। এই সমস্ত যুক্তির মাধ্যমে, প্রাবন্ধিক প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী এবং আধুনিক অবস্থান গ্রহণ করেছেন, যা একটি নতুন, সমতাপূর্ণ সমাজ গঠনের পথও দেখায়।

(৪)

কবি কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩) নারীশিক্ষাকে শুধুমাত্র প্রথাগত বিদ্যাচর্চার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে এর চেয়ে অনেক বিস্তৃত ও গভীর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। তিনি মনে করেন, প্রকৃত শিক্ষা হল চরিত্র গঠন এবং মনের সার্বিক বিকাশ। নারী ও পুরুষের শিক্ষার চূড়ান্ত লক্ষ্য একই— মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধন। এর জন্য প্রয়োজন জ্ঞান, সুরুচি, আত্মসংযম এবং পুণ্যাচরণের দ্বারা সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা ও পূজা। রক্ষণশীলরা যখন ছেলে ও মেয়েদের পৃথক পাঠক্রমে শিক্ষা দেওয়ার জোর দাবি জানিয়ে চলেছে, সেই সময় কামিনী রায়ের এই ভাবনা তাঁকে আলাদা মর্যাদা এনে দেয়। **'কৃষ্ণভাবিনী নারীশিক্ষা-মন্দির'** (প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩৭) রচনায় তিনি তৎকালীন সামাজিক প্রথার তীব্র সমালোচনা করে বলেছেন, নারীদের অবরুদ্ধ রেখে তাদের জ্ঞানচর্চার পথে ঘোর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করায় দেশ ও জাতির ক্ষতি হচ্ছে। এর আগে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রশ্ন করেছিল, যে দেশের পুরুষেরা বাণিজ্যে, যুদ্ধে কিংবা নতুন দ্বীপ, দেশ, গ্রহ আবিষ্কারের খোঁজে বহুদিন বাড়ির বাইরে থাকে সেই দেশের নারীদের সংসার নির্বাহের জন্য আত্মনির্ভর হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু ভারতবর্ষের পুরুষরা তেমন নয়, তাই 'আমাদের স্ত্রীলোকদিগকে আত্মনির্ভর করিতে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে কেন?'[১৮] এখানে 'আত্মনির্ভর' বলতে সাংসারিক ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ উপার্জনকে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু কামিনী দেবী এই ধারণার বিপরীতে গিয়ে ভিন্ন ধারায় ভাবতে শেখালেন। উল্লিখিত নিবন্ধে তিনি বলেছেন, নারীদের কেবল গৃহিণী বা পত্নী হিসেবে প্রস্তুত করাই শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। তারা যেন জ্ঞান, প্রেম এবং কর্মের দ্বারা নিজেদের উন্নত করে তোলে। আশা প্রকাশ করেছেন যে, শিক্ষার গুণে নারীরা বিজ্ঞানচর্চা, রাষ্ট্রীয় কর্ম এবং সামাজিক দুর্গতি ও দুর্নীতি নিবারণে আত্মনিয়োগ করবে; কেবল নিজেদের জীবনই নয়, পরিবার ও সমাজকেও উন্নত করবে; চারপাশের মানুষের জন্য সৌভাগ্য সঞ্চয় করবে, সমাজের প্রতি তাদের ঋণ শোধ করবে। তিনি শিক্ষাকে নিছক একটি বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে না দেখে 'মন্দির' অর্থাৎ ভক্তি ও নিষ্ঠার স্থান হিসেবে বিবেচনা করেছেন। কারণ, যেখানে শিক্ষাদান ব্যবসার মতো, সেখানে বিদ্যালয়কে মন্দির বলা সঙ্গত নয়। সময়ের তুলনায় অনেক বেশি প্রগতিশীল ও আধুনিক এই ভাবনা তাঁকে একজন দূরদর্শী চিন্তাবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বিশ শতকীয় বাঙালি 'ভদ্রমহিলা'-র ধারণা ছিল, মেয়েরা শিক্ষিত হয়ে পরিবারের কাজ সামলানোর পাশাপাশি দেশ ও জাতির জন্য আত্মনিয়োগ করবে। এখানে কামিনী রায় বাঙালি নারীদের সেই পথেই এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি আরও মনে করেন যে, একজন নারীকে যদি সুমাতা ও সুপত্নী হতে হয়, তবে একজন পুরুষকেও সুপিতা ও সুপতি হতে হবে। পুরুষতান্ত্রিক ধারণার বাইরে বেরিয়ে এই ভাবনা প্রাবন্ধিককে বিশিষ্ট করে তুলেছে।

পূর্বালোচিত 'বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষাবিচার' প্রবন্ধে ইন্দিরা দেবী বলেছেন, মেয়েরা স্বাভাবিক সংযমতার কারণে নতুন স্রোতে গা ভাসাতে অনিচ্ছুক এবং সাধ্যমতো পুরোনো প্রথার দিকে চলতে সচেষ্ট হয়। এই স্বভাব সমাজের রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে। সম্পূর্ণরূপে প্রাচ্যভাব অথবা পুরোপুরি পাশ্চাত্যভাব গ্রহণ না করে মধ্যপথ অবলম্বন করার পক্ষে অভিমত দেন তিনি। আসলে, পুরাতনের কোন অংশগুলি বর্জনীয়, নতুনের কোন অংশগুলি বরণীয় এবং কীভাবে এই দুয়ের মধ্যে সঙ্গত সম্মিলন সম্ভব এই নিয়ে দ্বন্দ্বে পড়েছিল তৎকালীন সমাজ। সমাজ-সংস্কারকদের কাছে এই প্রশ্নের উত্তর জানতে চেয়েছেন তিনি। প্রশ্ন করেছেন, ভারতরমণী কোন পথে কী প্রণালীতে এগোলে সমাজের কল্যান হবে। এর উত্তরে নিরুপমা দেবী 'কৃষ্ণভাবিনী নারীশিক্ষা-মন্দিরে' (প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২) প্রবন্ধে বলেছেন, আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে কিছু 'অবাঞ্ছিত বস্তু' বা 'আবর্জনা' প্রবেশ করলেও, এই শিক্ষা বন্ধ করা সম্ভব নয়। কারণ, এটি যুগের চাহিদার সঙ্গে এসেছে। তাঁর মতে, যুগধর্মের চাকা অন্ধ ঘোড়ার মতো ছুটে চলে এবং তার রাশ টানা অসম্ভব। বন্যার মতো আসা এই শিক্ষার গতিপথ রোধ করার কোনও উপায় নেই। এর ফলে পরিবারে বিশৃঙ্খলা, স্বাস্থ্যের অবনতি এবং অতিরিক্ত আর্থিক চাপের মতো সমস্যাগুলি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও তিনি বিশ্বাস করেন যে, এই শিক্ষা কেবল জ্ঞানের ক্ষুধা মেটানোর জন্য নয়, বরং নারীর অস্তিত্ব রক্ষার জন্যও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। এই আবর্জনাকে প্রতিহত করে শিক্ষাকে অপবাদশূন্য

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 71
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 593 - 606
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

করার জন্য প্রাবন্ধিক আশাবাদী। মনে করেন, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই শিক্ষার উপকারিতা পুরোপুরি বোঝা যাবে এবং এর নীতিগুলি ধীরে ধীরে সব অপবাদ থেকে মুক্ত হবে। উল্লেখ করেছেন যে, অনেক হৃদয়বান ও প্রজ্ঞাবান মানুষ নারীদের সুশিক্ষার জন্য তাদের হৃদয়, মন ও অর্থ ব্যয় করছে। তাদের প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে এমন পথ আবিষ্কৃত হবে, যে পথে আলো আসবে কিন্তু আবর্জনা কম প্রবেশ করবে। দেশের মেয়েদের মৌলিক ধর্মের প্রতি তাঁর বিশ্বাস ও নির্ভরতা রয়েছে। তাই তিনি ব্যবহারিক বা 'অপরা' বিদ্যার পাশাপাশি 'পরা' বিদ্যার উপরও জোর দেন। আসলে, পাশ্চাত্য প্রভাবে 'অপরা' বিদ্যার উপর অত্যাধিক গুরুত্ব দেওয়া হলেও ভারতবর্ষের চিরকালীন যে শিক্ষাব্যবস্থা সেখানে 'পরা' বিদ্যাই প্রাধান্য পেয়ে এসেছে। এর আগে প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩) নারীশিক্ষাকে আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপরই স্থাপন করার পরামর্শ দিয়েছেন।

> "The conclusion I came to, was that unless female education were placed on a spiritual basis, it would not be productive of real good."[১৯]

নিরুপমা দেবীর বক্তব্যেও একই অভিমত পরিস্ফুট হয়েছে। তিনিও 'পরা' বিদ্যার মধ্যেই ভারতের আসল মহিমা খুঁজে পেয়েছেন। মেয়েরা যখন পুরুষের সঙ্গে সব ধরনের শিক্ষার সমান দাবি করছে, তখন যেন এই আধ্যাত্মিক জ্ঞান থেকে তারা বঞ্চিত না হয়— এই প্রত্যাশা করেছেন। আরও চেয়েছেন, আধুনিক শিক্ষায় পারদর্শী হওয়ার পাশাপাশি মেয়েরা যেন সত্যের অনুসন্ধান করতে পারে, ব্রহ্মবাদিনী গার্গীর মতো হতে পারে। কারণ, শারীরিক দুর্বলতা থাকলেও মানসিক ও আত্মিক বলে নারীর কোনও ত্রুটি নেই। প্রচলিত ধারণা বরাবরই নারীর মানসিক ও আত্মিক শক্তিকে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করে এসেছে। এই বক্তব্য তাই পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে গিয়ে নারীর ক্ষমতায়ন, স্বাধীনতার জন্য একটি শক্তিশালী বার্তা প্রদান করে।

১৯২৭ সালে শিক্ষা বিভাগ একটি বিল পেশ করে, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রতিটি গ্রামীণ জেলায় শিক্ষা বোর্ড গঠন করে ছেলেদের জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাচালু করা। কিন্তু এই বিল থেকে মেয়েদের বাদ দেওয়ায় ১৯২৮ সালে 'বঙ্গীয় মহিলা শিক্ষা সম্মেলন'-এ বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী ও নারীমুক্তিকামী লতিকা বসু (১৯০২-১৯৮৭) এর কড়া সমালোচনা করেন। আন্দোলনের চাপে ১৯৩০ সালে '*The Bengal (Rural) Primary Education Act*'-*এর* চূড়ান্ত সংস্করণ পাস হয়, যেখানে মেয়েদেরও শিক্ষার সুযোগ অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[২০] কিন্তু এত কিছুর পরেও গ্রামীণ এলাকার মেয়েরা শিক্ষার সুযোগের অভাবে ভুগছিল। এই সমস্ত কারণে অবলা বসু (১৮৬৪-১৯৫১) গ্রামগঞ্জে নারীশিক্ষার উন্নয়নে অধিক গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেন তাঁর 'গ্রামের সমস্যা : স্ত্রীশিক্ষা' (প্রবাসী, চৈত্র ১৩৪২) প্রবন্ধে। দেখিয়েছেন, গ্রামের মেয়েদের জন্য পাঠশালাগুলি সংখ্যায় খুবই কম এবং সেখানে যোগ্য শিক্ষয়িত্রীর অভাব দেখা যায়। পাঠশালার পরিবেশ সুন্দর বা প্রশস্ত নয়। লাইব্রেরি, খেলাধুলা বা আমোদ-প্রমোদের কোনও ব্যবস্থা নেই। অভিভাবকরাও মেয়েদের শিক্ষায় উদাসীন। এই সমস্যাগুলি দূর করতে হলে প্রথমে গ্রামবাসীকে শিক্ষার গুরুত্ব বোঝাতে হবে। আরও বলেন, শিক্ষার মাধ্যমেই গ্রামের আর্থিক, নৈতিক ও সার্বিক উন্নতি সম্ভব। এইজন্য প্রতি চার-পাঁচটি গ্রাম নিয়ে একটি করে শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে। এই কেন্দ্রগুলি গ্রামের নাড়ির সঙ্গে যোগ রেখে দৈহিক, নৈতিক, সামাজিক, আর্থিক ও মানসিক সমস্যার সমাধানে কাজ করবে। কেবল বালক-বালিকাদের নয়, অন্তঃপুর ও জনসাধারণের অজ্ঞতা দূর করতেও সাহায্য করবে। এই কেন্দ্রগুলি গড়ে তোলার জন্য শিক্ষাদীক্ষায়, চরিত্রে এবং আদর্শে উজ্জ্বল, ত্যাগী কর্মীমণ্ডলী প্রয়োজন বলে তাঁর অভিমত, যাদের জ্ঞান ও শ্রদ্ধা গ্রামের মানুষকে আকৃষ্ট করতে পারবে।

এছাড়াও, গোটা দেশের নারীশিক্ষাব্যবস্থার দুরাবস্থা নিয়েও কথা বলেছেন এই প্রবন্ধে। দেখিয়েছেন, উন্নত দেশগুলির তুলনায় ভারতের শিক্ষার হার অতি নগণ্য। যেখানে উন্নত দেশগুলিতে শতকরা ৯০-৯৫ জন লিখতে-পড়তে পারে, সেখানে ভারতে প্রায় ততজন বা তারও বেশি সংখ্যক মানুষ নিরক্ষর। শিক্ষাব্যবস্থার এই দুর্বলতার পেছনে মেয়েদের শিক্ষার প্রতি উদাসীনতা একটি বড়ো কারণ। যেহেতু মেয়েদের কর্মক্ষেত্র সাধারণত অন্তঃপুরে সীমাবদ্ধ এবং তাদের সংসারের আর্থিক সমস্যার সমাধান করতে হয় না, তাই তাদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমাদের মন ততটা সজাগ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 71
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 593 - 606
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

নয়। শিক্ষা যে কেবল উপার্জনের জন্য নয়, তা মানবজাতির ব্যক্তিগত, পরিবারগত, সমাজগত ও রাষ্ট্রগত প্রয়োজনে কল্যাণ সাধনের পথ উন্মুক্ত করে, একথা প্রাবন্ধিক স্মরণ করিয়ে দেন।

নিরুপমা দেবীর মতো কমলা দেবী (?)-ও নারীর 'পরা' এবং 'অপরা' উভয়প্রকার শিক্ষার পক্ষে যুক্তি সাজিয়েছেন। 'স্ত্রী-শিক্ষা' (প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৪৭) প্রবন্ধে নারীশিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছেন, শিক্ষা মানুষকে বর্বরতা থেকে সভ্যতায়, পশুত্ব থেকে মনুষ্যত্বে এবং মনুষ্যত্ব থেকে দেবত্বের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এর চূড়ান্ত লক্ষ্য হল মানুষের ভেতরের কল্যাণময়, আনন্দময় এবং পরমসুন্দর সত্তাকে প্রকাশ করতে সহায়তা করা। জীবন-ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যাকে 'অপরা বিদ্যা' বলা হয়, যা কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য সংক্রান্ত। অন্যদিকে, 'পরা বিদ্যা' হল ব্রহ্মকে জানার এবং উপলব্ধি করার জ্ঞান। পুরুষ এবং নারী একে অপরের পরিপূরক। মনুষ্যত্ব অর্জনের জন্য উভয়েরই এই দুইপ্রকার বিদ্যার প্রয়োজন, যাতে তারা মর্যাদার সঙ্গে বাঁচতে পারে। দেখিয়েছেন যে, পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থাটি কোনও স্বাভাবিক প্রথা নয়। ক্ষমতার প্রাধান্য এবং যৌন সংস্কারের উপর ভিত্তি করে এটি গড়ে উঠেছে, যা সমাজ, ধর্ম, সাহিত্য ও শিল্পের মাধ্যমে বছরের পর বছর ধরে স্বাভাবিক বলে গৃহীত হয়ে আসছে। এইভাবে পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে আঙুল তুলে বলেন, মাতৃত্বের কারণে দৈহিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পুরুষ এমন কিছু বিধান তৈরি করেছে, যা নারীকে পিছিয়ে দিয়েছে। প্রজনন, মাতৃত্ব ইত্যাদি দিয়ে নারীকে সংজ্ঞায়িত করা হলেও, নারী যে একজন মানুষ এবং তার মনুষ্যত্ব যে মাতৃত্বের ঊর্ধ্বে, তা তারা ভুলে গিয়েছিল। এই সাহসী বিশ্লেষণ প্রচলিত ধারণাকে ভেঙে দিয়েছে, যা আধুনিক নারীবাদী চেতনার একটি মূল বৈশিষ্ট্য।

এইভাবে একদিকে নারী-পুরুষের সমান মর্যাদা, সমান শিক্ষার দাবি করা হলেও বিরোধী মতবাদের অভাব ছিল না। রেণুকা মুখোপাধ্যায় (?) তাঁর **'বর্ত্তমানে ভারতীয় স্ত্রীশিক্ষার কতগুলি সমস্যা'** (প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৫২) রচনায় বলেছেন, বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন, মেয়েদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির আর্থিক সংকট দূর করার পাশাপাশি পাঠ্য বিষয়ের পরিবর্তন করাও দরকার। মাধ্যমিক স্তর থেকে মেয়েদের জন্য গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, ভারতীয় শিল্পকলা, সঙ্গীত এবং সূচিশিল্পের মতো বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। কারণ, পুরুষের শিক্ষা চাকরির জন্য হলেও, নারীর শিক্ষা মানসিক ও পারিবারিক উন্নতির জন্য। যতদিন না পর্যন্ত এই সমস্যাগুলির সমাধান করা হয়, ততদিন নারীশিক্ষার উন্নতি হবে না।

নীলিমা চৌধুরী রচিত 'বাংলাদেশ ও রুশিয়ার নারীশিক্ষার প্রগতি' (প্রবাসী, কার্তিক ১৩৫২) প্রবন্ধে বাংলাদেশ ও রাশিয়ার নারীশিক্ষার তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। দেখিয়েছেন যে, ১৯১৮ সালের বিপ্লবের পর মাত্র বাইশ বছরের মধ্যে সোভিয়েত রাশিয়া নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি লাভ করে। সমাজতান্ত্রিক আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব এবং সোভিয়েত নীতির যথার্থ এই অগ্রগতির মূল কারণ। রুশ বিপ্লবের পর, নারীদের পুরুষদের সঙ্গে সমান অধিকার দেওয়া হয়, যা তাদের অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয়, সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়। এমনকি, ১৯৪৪ সালে রাশিয়ার আয়-ব্যয়ের পরিকল্পনায় দেশরক্ষার থেকেও শিক্ষার জন্য বেশি অর্থ বরাদ্দ করা হয়। অন্যদিকে, বাংলাদেশের নারীশিক্ষার অবস্থা অত্যন্ত করুণ। ১৯৪১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, বাংলাদেশে মোট শিক্ষিতের হার ১৬.১%, যার মধ্যে শিক্ষিত নারীর সংখ্যা ছিল মাত্র ২.৬১%। এর মধ্যে অধিকাংশই প্রাথমিক স্তরের। মুষ্টিমেয় সংখ্যক উচ্চশিক্ষিত নারীদেরও সমাজের রক্ষণশীল অংশের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরনের সমালোচনার শিকার হতে হয়। অভিযোগ ওঠে, শিক্ষিত মেয়েরা রান্নাঘরের কাজ ও সন্তান পালনে অপারগ এবং তাদের মধ্যে বিলাসিতা ও অতিরিক্ত খরচের প্রবণতা বেশি, তাই তাদের বিয়ের জন্য পাত্র যোগাড় করা কঠিন। প্রাবন্ধিক এই অভিযোগগুলির বিপরীতে যুক্তি দেন যে, পরিমিত প্রসাধন সুরুচির পরিচায়ক এবং বিলাসিতার মোহ স্বল্পশিক্ষিত বা নিরক্ষর মেয়েদের মধ্যেও কম দেখা যায় না। আরও বলেন, কিছু উচ্চশিক্ষিত মেয়ের মধ্যে যদি কোনও নেতিবাচক আচরণ দেখা যায়, তার জন্য দায়ী সেই পরিবারের শিক্ষার ধারা এবং পারিবারিক প্রশ্রয়। তাই বাংলার নারীশিক্ষার উন্নতির জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলেছেন তিনি। প্রথমত, শিক্ষার জন্য অর্থবরাদ্দ বৃদ্ধি করা দরকার। দ্বিতীয়ত, বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা আধুনিক যুগের উপযোগী নয়। তাই, অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন, স্বাধীন চিন্তা ও সংসার-বন্ধনের সামঞ্জস্য রক্ষা করে নারীশিক্ষাকে পুনর্গঠন করা উচিত। তৃতীয়ত, নারীশিক্ষার অগ্রগতির জন্য পুরুষ সমাজের প্রগতিমূলক ঐকান্তিক সহানুভূতি ও মমত্ববোধ অত্যন্ত জরুরি। চতুর্থত, প্রচলিত

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 71
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 593 - 606
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সামাজিক কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস দূর করতে হবে, কারণ শিক্ষাই পারে মানুষকে উদারমনা ও সত্যনিষ্ঠ করতে। পরিশেষে, প্রাবন্ধিক জোর দিয়ে বলেছেন যে, রাশিয়ার মেয়েরা যদি তাদের শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয় জীবনে এত বড়ো অবদান রাখতে পারে, তবে বাংলাদেশের মেয়েরাও তা পারবে, কারণ নারী জাতিভেদে ভিন্ন নয়। এইভাবে প্রাবন্ধিক প্রচলিত ধ্যান-ধারণা ভেঙে নারীশিক্ষার গুরুত্ব, অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা এবং সামাজিক অগ্রগতির জন্য নারীদের সম-অধিকারের পক্ষে জোরালো যুক্তি দিয়েছেন। রাশিয়ার মতো একটি সফল দেশের উদাহরণ ব্যবহার করে তিনি নিজের বক্তব্যকে আরও শক্তিশালী করেছেন।

(৫)

১৯৩০ ও ১৯৪০-এর দশকে সরলা দেবী চৌধুরানী, অবলা বসু, সরলা রায় (১৮৬১-১৯৪৬), হেমলতা দেবী (১৮৬৮-১৯৪৩) ও লীলা নাগ (১৯০০-১৯৭০)-এর মতো অনেক শিক্ষানুরাগী নারীশিক্ষার প্রসারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তাঁদের আদর্শ ও শিক্ষাদানের পদ্ধতিতে ভিন্নতা থাকলেও কলকাতা, ঢাকা ও বরিশালের মতো শহরে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে অসংখ্য মেয়েদের জন্য শিক্ষার সুযোগ করে দিতে পেরেছিলেন তাঁরা। এই প্রতিষ্ঠানগুলি সেলাই, রান্না ও গার্হস্থ্য অর্থনীতির মতো বিষয়গুলির পাশাপাশি পাটিগণিত, ইতিহাস ও ভূগোল বিষয়েও শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করে। তাই বলা যায়, মেয়েদের শিক্ষাব্যবস্থা কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে ভাবনার পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত ভাবনাও এই সময়কার বাঙালি 'ভদ্রমহিলা'-র অন্যতম আলোচ্য বিষয়। কৃষ্ণভাবিনী দাস লক্ষ করেছেন, বাংলার নারীশিক্ষাব্যবস্থা ইউরোপের অন্ধ অনুকরণে হওয়ায় অধিকাংশ ছাত্রীই কেবল পাশ্চাত্য আদব-কায়দা রপ্ত করছে। এতে তাদের উপকারের তুলনায় অপকারই হচ্ছে। তাই 'জলন্দর কন্যা-বিদ্যালয়' (প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৩০) রচনায় দেখিয়েছেন, পাঞ্জাবের এই নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে মেয়েদের আর্থিক শিক্ষার পাশাপাশি পারমার্থিক জ্ঞানের উপর জোর দেওয়া হয়। সেখানে তারা ব্রহ্মচর্য পালন, আত্মোৎসর্গ ও ত্যাগের মধ্যে দিয়ে দৈহিক ও আত্মিক উন্নতি লাভ করতে পারে। এই শিক্ষাপদ্ধতি সেখানকার নারীদের মধ্যে এক ধরনের শক্তি জাগিয়ে তুলেছে যা তাদের হাজার হাজার পুরুষের মাঝে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতে, গ্রামে গ্রামে হেঁটে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে এবং কঠোর জীবন-যাপন করতে সহায়তা করে। মেয়েদের জন্য এমন শিক্ষাব্যবস্থা বাংলায়ও হওয়া প্রয়োজন বলেই তাঁর অভিমত। এর আগে ১৩১৬ বঙ্গাব্দে হেমন্তকুমারী চৌধুরীও বলেছেন পাঞ্জাবের সমাজ-সংস্কারকদের বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে এবং নারীশিক্ষার পক্ষে আন্দোলনের কথা। আরও বলেছেন, পাঞ্জাবে নারীশিক্ষার অবস্থা বাংলার তুলনায় এগিয়ে থাকার কারণ, সেখানে অবরোধ প্রথা বহুলাংশেই শিথিল এবং আর্যসমাজের প্রচেষ্টায় শিক্ষিত সমাজে বাল্যবিবাহের সংখ্যা অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে।[২১] কামিনী রায় 'কৃষ্ণভাবিনী নারীশিক্ষা-মন্দির' (প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩৭) রচনায় বলেছেন প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষার্থীদের 'প্রকৃত শিক্ষা'-য় শিক্ষিত করে তোলে। অর্থাৎ কেবল লিখতে-পড়তে পারা, স্মরণশক্তির চর্চা বা কোনও বিশেষ জ্ঞান লাভ করা নয়, শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক শক্তিসমূহের অনুশীলন, যথাযথ পরিচালনা এবং উৎকর্ষ সাধনের পাশাপাশি তাদের চরিত্র ও সামাজিক দক্ষতা বৃদ্ধি তথা শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশ এখানকার শিক্ষা-পদ্ধতির মূল বৈশিষ্ট্য। তিনি কৃষ্ণভাবিনী নারীশিক্ষা-মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতাদের ধন্যবাদ জানান, যাঁরা নারীদের উন্নত জীবনে দিকে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। আশা করেছেন, শিক্ষার গুণে নারীরা ভবিষ্যতে বিজ্ঞানচর্চা, রাষ্ট্রীয় কর্ম এবং সামাজিক দুর্নীতি নিবারণে নিজেদের নিয়োজিত করতে পারবে। প্রতিষ্ঠানটি সম্বন্ধে নিরুপমা দেবী 'কৃষ্ণভাবিনী নারীশিক্ষা-মন্দিরে' (প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২) নিবন্ধে বলেন, এর প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালকেরা দেশের কন্যাদের নির্দোষ এবং সুশিক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য নিজেদের হৃদয়, মন এবং বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করেছেন। তাঁরা মেয়েদের দেশগত শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং গৃহ-গঠন অক্ষুণ্ণ রাখার বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করেন।

বিশ্বভারতীকে নারীশিক্ষার জন্য আদর্শ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করেছেন প্রাবন্ধিক আশা দেবী (?)। 'বিশ্বভারতী— নারী বিভাগ' (প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৩৯) রচনায় বলেছেন, এখানে শুধু পাঠ্যপুস্তকের উপর নির্ভর না করে হাতে-কলমে শিক্ষারও ব্যবস্থা করা হয়। বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচিতি লাভের উপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। বিশ্বভারতীর আদর্শ হল এমন শিক্ষা প্রদান করা যা মানব প্রকৃতির কোনও অংশকে খর্ব না করে তার সমগ্র বিচিত্রতাকে সহজ ও সম্পূর্ণভাবে বিকশিত হতে সুযোগ দেয়। আরও বলেছেন, প্রতিষ্ঠাতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনে এমন

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 71
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 593 - 606
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

একটি ক্ষেত্র তৈরি করেছেন, যেখানে মেয়েরা তাদের বুদ্ধিবৃত্তি, জ্ঞান, সৌন্দর্যবোধ, সেবা ও কর্মকুশলতা—সকল দিক থেকে নিজেকে প্রকাশ ও সৃষ্টি করার সুযোগ পায় এবং তাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ ও সার্থক করে তোলে। গ্রামের নরনারী ও শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক জীবন বা আর্থিক সমস্যা সমাধানের জন্য হাতে-কলমে কাজ করার সুযোগ রয়েছে। ভারতবর্ষের অন্য কোনও নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই শিক্ষাব্যবস্থা সহজলভ্য নয় বলেই তাঁর অভিমত। কনকলতা রায় তাঁর 'গোখলে বালিকা-বিদ্যালয়' (প্রবাসী, পৌষ ১৩৪০) প্রবন্ধে প্রতিষ্ঠানটি সম্বন্ধে বলেছেন, এখানে গতানুগতিক শিক্ষা পদ্ধতির বাইরে গিয়ে ছাত্রীদের সার্বিক বিকাশের উপর জোর দেওয়া হয়। ১৯২০ সালে মহিলা সমিতির পরামর্শে নতুন পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য নিয়ে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যক্তিগত যত্ন, জ্ঞানতৃষ্ণা, সৃষ্টিশীলতা, আত্মপ্রকাশ এবং আত্মোন্নতি এর উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত।

(৬)

নারীশিক্ষার উদ্দেশ্য, পদ্ধতি নিয়ে বিতর্ক ছিল উনিশ শতকেই। অধিকাংশ নারী পুরুষতান্ত্রিক মতাদর্শ দ্বারা পরিচালিত হয়ে সাংসারিক জীবনে উন্নতিলাভকেই নারীশীক্ষার একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করে। বিশ শতকে এসেও একই ভাবধারা পরিলক্ষিত হয়। তবে, সকল নারীকণ্ঠকে তারা দমিয়ে রাখতে পারেনি। সুমাতা, সুপত্নী হওয়ার এই বিধানকে তারা যেমন আক্রমণ করেছে, তেমনই জ্ঞান অর্জনের শিক্ষাকে বরণ করে নিতে চেয়েছে। তাইতো, ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী নারীশিক্ষার ফলফল সম্বন্ধে সন্দিহান থাকলেও শান্তা দেবী বলেছেন নারীশিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল গৃহিনী হওয়ার মধ্যেই সীমাদ্ধ না থেকে আরও উচ্চ আদর্শের দিকে ধাবিত হওয়া উচিত। বেগম রোকেয়া আরও কয়েকধাপ এগিয়ে 'লেডীমাজিষ্ট্রেট', 'লেডীব্যারিষ্টার', 'লেডীজজ' বানাতে চেয়েছেন মেয়েদের। তাই অনুরূপা দেবী, সত্যবালা দেবী, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, চারুচন্দ্র মিত্রেরা রক্ষণশীল ভাবনা ভাবলেও সেগুলির প্রতিবাদ বর্ষিত হয় জ্যোতির্ময়ী দেবী, সোনামাখা দেবী, কামিনী রায় সহ বঙ্গনারী ছদ্মনামে লিখিত কলমে। তাঁরা বলার সাহস পেয়েছেন যে, নারীরা উৎপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠার ভয় থেকেই পুরুষরা তাদের শিক্ষিত করতে চায় না। নারীশিক্ষার বিরোধী মতবাদের সমালোচনা করে বলেছেন, যদি মেয়েরা প্রথাগত শিক্ষা ছাড়াই 'আদর্শ শিক্ষিতা' হতে পারে, তাহলে এই একই যুক্তি পুরুষদের ক্ষেত্রে কেন প্রযোজ্য নয়? পুরুষরা কেন তাহলে জীবনের এত মূল্যবান সময় ও বিপুল অর্থ খরচ করে স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছে? কারণ, বাস্তব বলছে, শত চেষ্টা করেও সবাই 'আদর্শ শিক্ষিত' পুরুষ হতে পারে না। আরও বলা হয়েছে, যদি শিক্ষা নারীকে বিপথগামী করে, তবে কি তা পুরুষদের ক্ষেত্রে করে না? পুরুষেরা যদি স্বাধীনতা ব্যবহার করে সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে পারে, তাহলে নারীরা কেন তা পারবে না? একজন নারীকে যদি সুমাতা ও সুপত্নী হতে হয়, তবে একজন পুরুষকেও সুপিতা ও সুপতি হতে হবে— এমন দাবিও উঠেছে। একইসঙ্গে, পাঞ্জাব এমনকি বিদেশি রাষ্ট্র রাশিয়ার সঙ্গে তুলনা করে দেখানো হয়েছে বাংলার নারীশিক্ষা কোথায় এবং কতটা পিছিয়ে, এর উন্নতি কীভাবে সম্ভব। কোন কোন প্রতিষ্ঠানের গেলে নারীরা উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারবে সেই সম্বন্ধে আলোচনাও আমরা পাই। বুঝতে পারি, উনিশ শতকীয় নব ধ্যান-ধারণার সঞ্চার বেশ কিছু নারীদের মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ভাবনা ভাবতে শিখিয়েছে, আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য রক্ষণশীলদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার প্রেরণা যুগিয়েছে। বিশ শতকে এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায়। তাঁরা বুঝতে পেরেছেন যে, শিক্ষা কেবল ব্যক্তিগত উন্নতির মাধ্যম নয়, এটি তাঁদের স্বাধীনতার চাবিকাঠিও। সেই উপলব্ধি থেকেই তাঁরা শুধু নিজেরাই শিক্ষিত হননি, অপরকে শিক্ষিত করার জন্যেও সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছেন। এই প্রবন্ধগুলি সেই উদ্দেশ্যেই লেখা। তাঁদের এই সম্মিলিত প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য, সমাজের গতানুগতিক ধ্যান-ধারণার বিরোধিতা করে নিজেদের জন্য একটি নতুন পরিচয় তৈরি করা। 'মন্টেগু-চেমসফোর্ড আইন' (১৯১৯)-এ বলা হয়েছিল, শুধুমাত্র একটি লিঙ্গের মধ্যে শিক্ষা সীমাবদ্ধ থাকলে সামাজিক অগ্রগতি সম্ভব নয়।

> "...in India social customs have greatly multiplied the difficulties in the way of female education. Upon this question opinion is slowly but surely changing, and educated young men of the middle-classes are beginning to look for literate wives. But so long as education is practically confined to one sex the social complexion of the country must react upon and retard political progress; and for this reason we regard the great

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 71
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 593 - 606
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> gulf between men and women in respect of education as one of the most serious problems which has to be faced in India."[২২]

এই অভিমতে প্রভাবিত, আধুনিক শিক্ষার আলোয় আলোকিত নারীরা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হন, যা তাঁদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে অংশগ্রহণের পথ সুগম করে। এর ফলস্বরূপ তাঁরা বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা এবং অন্যান্য কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে পেরেছেন এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে সমাজে নিজেদের স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছেন।

Reference:

১. দেবী, বামাসুন্দরী দেবী, 'কি কি কুসংস্কার তিরোহিত হইলে শীঘ্র এদেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে', দ্র. প্রসূন ঘোষ, অহনা বিশ্বাস (সম্পা.), 'অন্দরের ইতিহাস নারীর জবানবন্দী', প্রথম খণ্ড, কলকাতা, গাঙচিল, ২০১২, পৃ. ৪৪-৪৫
২. দেবী, কৈলাসবাসিনী, 'হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা', কলকাতা, গুপ্ত প্রেস, ১৮৬৩, পৃ. ৬৫
৩. দেবী, জ্যোতির্ময়ী, 'বালিকা বিদ্যালয় ও বালিকাদের শিক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা', 'প্রতিভা', জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮, পৃ. ৭১-৭২
৪. চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ, 'বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ও স্ত্রীশিক্ষা', 'প্রবাসী', অগ্রহায়ণ ১৩৩৬, পৃ. ৩১৬-৩১৭
৫. তদেব
৬. রোকেয়া, বেগম, 'স্ত্রীজাতির অবনতি', দ্র. আবদুল কাদির (সম্পা.), রোকেয়া-রচনাবলী, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭১, পৃ. ২০
৭. তদেব
৮. নাহার, শামসুন, 'রোকেয়া জীবনী', কলকাতা, বুলবুল পাবলিশিং হাউস, ১৯৩৭, পৃ. ৯২
৯. সেন, দীনেশচন্দ্র, 'গৃহশ্রী', কলকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, নবম সংস্করণ, চৈত্র ১৩৩০, পৃ. ৩২
১০. দেবী, জ্যোতির্ময়ী, 'নারীর কথা', 'ভারতবর্ষ', আষাঢ় ১৩২৮, পৃ. ৬২
১১. দেবী, জ্যোতির্ময়ী, 'নারী-সমস্যা', 'ভারতবর্ষ', আশ্বিন ১৩২৮, পৃ. ৪৯০
১২. জ্যোতিরত্ন, উপেন্দ্রনাথ, 'নারীর কথা'য় নরের জবাব', 'ভারতবর্ষ', আশ্বিন ১৩২৮, পৃ. ৪৯১-৪৯৩
১৩. 'শিক্ষিত মহিলার দায়িত্ব', 'বামাবোধিনী পত্রিকা', ফাল্গুন-চৈত্র ১৩১০, পৃ. ৩৪২-৩৪৭
১৪. Annie Besant, Speeches and Writings, p. 73
১৫. গঙ্গোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রনাথ, 'মাতৃশক্তিপীঠ', 'পরিচারিকা', জ্যৈষ্ঠ-কার্তিক ১৩২৯, পৃ. ১৬৯
১৬. সুনীতিবালা গুপ্ত, 'স্ত্রীশিক্ষা', 'ভারত-মহিলা', বৈশাখ ১৩১৭, পৃ. ১১
১৭. শাস্ত্রী, শিবনাথ, 'মহাত্মা বেথুন ও বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষা', 'প্রবাসী', ভাদ্র ১৩১১, পৃ. ২৫৫
১৮. 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', ১৮০২ শকাব্দ, পৃ. ২১৭-২১৮
১৯. প্রাপ্তি: মাইতি, মাধবী, 'অবলা সন্দর্ভ', কলকাতা, প্যাপিরাস, ২০১২, পৃ. ১২৬
২০. See, Dan, Piyali, Women and Education: Bengal 1820-1947, Phd Thesis, Santiniketan, Visva-Bharati, 2020
২১. প্রাপ্তি: সুর, নিখিল, বিশ শতকের প্রথম আলোয় বঙ্গনারী, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., ১৯২৪, পৃ. ৫২
২২. Report on Indian Constitutional Reforms, Presented to both Houses of Parliament by Command of His Majesty, Published by His Majesty's Stationary Office, London, reprinted in 1925, p. 151-152